রাষ্ট্রচিন্তা

বাংলাদেশের ইতিহাস, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পটভূমিতে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান ২০২৪

- ***মোহাম্মদ আজম***

প্রস্তাব

ছাত্র-জনতার জুলাই-অভ্যুত্থান ২০২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসে কতটা তাৎপর্য বহন করতে থাকবে, তা নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। তবে ঘটনা ও সংঘটন হিসাবে এ যে অভাবনীয় এবং ঘটনা হিসাবে নিজগুণেই মহিমান্বিত, তাতে কোনো পক্ষের সন্দেহ দেখা যায়নি। অভ্যুত্থানের গঠন ও প্রভাব চলমান আছে। সে অর্থে এটা বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষভাবে 'বর্তমান', যার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের অনেকাংশ স্থির হবে। বর্তমান প্রস্তাবে এ পটভূমিতে আমরা ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে মূল্যায়ন করতে চাইব। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বর্তমানকে স্থাপন করে তার নিরিখে ভবিষ্যতের ইশারা প্রণয়নই এর লক্ষ্য।

অভ্যুত্থান ও মুক্তির ধারণা

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের অন্তত শেষ এগার বছরের শাসনে ফ্যাসিস্ট শাসনের ও মতাদর্শের নানা উপাদান থাকলেও একে আসলে আধা-ফ্যাসিস্ট, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন বলাই শ্রেয়। তার

অনেকগুলো কারণের মধ্যে দুটির উল্লেখ করি। প্রথমত, ফ্যাসিস্ট শাসনের ক্লাসিক উদাহরণগুলোতে (যেমন ইতালি ও জার্মানি) ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাসের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের মোটামুটি ব্যাপক সমর্থন দেখা গেছে। বাংলাদেশে গত অন্তত বছর দশেকের বাস্তবতা বিশেষভাবে আলাদা। তথ্য-প্রমাণ বলছে, গত বার-তের বছরের মধ্যে যেকোনো সময় সাধারণ নির্বাচন হলেই আওয়ামী-বিরোধী শিবিরই ক্ষমতায় আসত। এ শাসন জনগণের মধ্যে মোটেই জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিস্ট শাসনগুলোর, এমনকি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রেও (যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর বা দক্ষিণ কোরিয়া), জনসম্মতির পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনা, রাষ্ট্রের ও জনগণের উন্নতি, আদর্শিক দৃঢ়তা এবং নীতি-নৈতিকতার প্রবলতা দেখা গেছে। আওয়ামী-রেজিমে এসব বস্তু বিন্দুমাত্রও লক্ষ করা যায়নি। দুর্নীতি ও লুটপাটই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাজেই একে ‘ফ্যাসিস্ট’ শাসন বলে সম্মানিত না করাই ভালো।

নাম যা-ই হোক না কেন, আওয়ামী-শাসন বাংলাদেশের উপর এক ভয়ঙ্কর দানব হয়ে চেপে বসেছিল। মনে রাখতে হবে, এটা ১৯৯৬-এর আওয়ামী-শাসন নয়। এমনকি ২০০৮-এর শাসনও নয়। সর্বব্যাপী প্রস্তুতি, ভিনদেশের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ ও আনুকূল্য, একাত্তর-১৫ আগস্ট-২১ আগস্টের ‘গল্প’, এজেন্সির নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, প্রকল্পশাসিত উন্নয়নের মিথ এবং ‘বঙ্গবন্ধু-কন্যা’র সুবিধাজনক অবস্থান মিলে ২০১২-১৩ থেকে বাংলাদেশে এই ভয়াবহ শাসন পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হতে থাকে। এর ফলে একদিকে ভদ্রলোকশ্রেণির জন্য লিবারেল স্পেসগুলো শোচনীয়ভাবে সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে লুটপাট, অনাচার ও অর্থপাচারের মধ্য দিয়ে জনগণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে।

বিদ্যমান রাজনৈতিক শক্তিগুলো নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় অথবা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ অবস্থা থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্ত করার কোনো সম্ভাবনা তৈরি করতে পারছিল না। এ কারণেই অভ্যুত্থান এত জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান কেবল ক্ষমতার বদল হিসাবে পরিগণিত না হয়ে এক সার্বিক মুক্তির সম্ভাবনা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে।

শিল্পী : সুলতান ইশতিয়াক

অভ্যুত্থানের নামায়ন

এ আন্দোলনের নামায়নের প্রশ্নে 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান' অভিধাটা ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়। দুনিয়ার অন্য নানা বিপ্লবের সাথে এর অমিলের কারণে একে বিপ্লব বলা যাবে না, তা না। বরং ক্ষমতাকাঠামোয় যে ধরনের আমূল পরিবর্তনহেতু রাষ্ট্রকাঠামোয় আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়ে ওঠে, এ ঘটনায় তার কিছু উপাদান থাকলেও তা বিশেষভাবে দানা বাঁধেনি – সেটাই এ নামায়নের হেতু। অবশ্য এর বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনা যে শেষ হয়ে যায়নি, সে কথাও উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এ অভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান। কিন্তু প্রক্রিয়াগত এবং চিহ্ন-বিচারের দিক থেকে দেখলে এটা আসলে ছাত্রদের/শিক্ষার্থীদের অভ্যুত্থান। শুধু তাই নয়। ভাবার অবকাশ আছে, ছাত্র-আন্দোলন না হলে এবং 'ছাত্র' মারা না গেলে এ শোক এবং প্রতিরোধ এত সর্বব্যাপী হতে পারত না। এ ঘটনার শ্রেণিগত ও প্রতীকী তাৎপর্যের সাথে বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের খানিক মিল আছে।

ছাত্রদের মধ্যেও আবার মূল অনুঘটক ছিল নারী-ছাত্রদের অংশগ্রহণ। হলগুলো থেকে প্রায় সব নারী-ছাত্র যখন হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল, তখন আন্দোলনের যে সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আর কোনো কিছুতেই তা হতে পারত না। ওই রাতে 'বহিরাগত' সন্ত্রাসীরা নিপীড়ন করেছে, বিশেষত নারী-ছাত্রদের নিপীড়ন করেছে – এটা ছিল আন্দোলনের অন্যতম প্রধান টার্নিং পয়েন্ট। এরই মধ্যে আন্দোলন তার সবচেয়ে কার্যকর ও পরিচিত ছবিটি পেয়ে গেছে – আবু সাঈদের বুক চিতিয়ে গুলির সামনে এগিয়ে যাওয়া। ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বন্ধ করে দেয়ার পরে আন্দোলনটি হয়ত গতি ও বিধি হারাত, যদি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক জমায়েত, আগ্রাসী মনোভাব ও অবিশ্বাস্য প্রাণদানের মধ্য দিয়ে একে বেগবান না করত। এর মধ্য দিয়ে দুটি বড় ঘটনা ঘটেছে। একদিকে ঢাকা ও বাংলাদেশের নাগরিক-মধ্যবিত্ত সমাজের সাথে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাপক প্রাণহানীর মধ্য দিয়ে খুনী শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সর্বশেষ পরিচয় জাতির সামনে উন্মোচিত করেছে। দেশের প্রায় সমগ্র জনগোষ্ঠী আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

কোটা আন্দোলনের বদলে 'বৈষম্যবিরোধী' নামটি যেভাবে আর যে কারণেই ঠিক হোক, এখন আন্দোলন-উত্তরকালে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, চাকরির আন্দোলনকে সরকার-পতনের আন্দোলনে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে এ নাম খুব বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এ নামের অন্তর্গত বিস্তার খুব সহজেই শাসকগোষ্ঠীর তৈরি করা সার্বিক বৈষম্যকে ধারণ করতে পেরেছে। 'চাকরি' বা 'কোটা' নাম থাকলে এ বিস্তারকে ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ত।

সরকার-বিরোধী মনোভাব তো আগে থেকেই তুঙ্গে। সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা দ্রুত এক দফায় উন্নীত হয়। শাসককুলের মনোভাব ও উচ্চারণভঙ্গি তাতে বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আসলে স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক আর আধা-ফ্যাসিস্ট শাসকের ভাষাভঙ্গি অন্যরকম হওয়ার কোনো উপায় ছিল না। অন্যরকম ভাষা তারা বহু আগেই ভুলেছে। কাজেই ১৭/১৮ জুলাইয়ের পরে আন্দোলনকে বশীভূত করার কোনো উপায় সরকারের হাতে ছিল না। কারণ, এর মধ্যেই নতুন ভাষা, যুক্তি, চিহ্ন আর দ্রোহ জ্বলে উঠেছিল।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কেন অনুরূপ সাফল্য পায়নি

জরুরি প্রশ্ন হল, বিএনপি বা জামায়াতের মতো প্রতাপশালী বিরোধী দলগুলো আগে এত চেষ্টা করেও এ ধরনের বা কাছাকাছি কোনো সাফল্য পায়নি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যেই সরকার-পতনের ভিতর দিয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা এ দলগুলোর দুর্বলতা খতিয়ে দেখতে হবে। স্পষ্টতই পার্টি-লাইনে পরিচালিত ওসব আন্দোলনে নাগরিক মধ্যবিত্ত এবং বিশেষত সাধারণ তরুণ-সমাজ মোটেই অংশ নেয়নি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিশ্চয়ই সবার আগ্রহের কেন্দ্রে ছিল। কিন্তু যারা সেই প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করছিল, তারা নতুন সময়ের নতুন আকাঙ্ক্ষার সাথে পরিচিত ছিল না। এমনকি তাদের ভাষার মধ্যেও নাগরিক তরুণদের ভাষা মোটেই অনূদিত হয়নি। তার প্রধান কারণ, পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা থেকে সবার কাছেই এটা পরিষ্কার যে, কেবল ক্ষমতা-বদল মানুষের ভাগ্য, অবস্থা বা সম্মানের কোনো বদল ঘটাতে পারবে না। তারা চাচ্ছিল নতুন ভাষা ও নতুন কর্মসূচি। আমাদের বিরোধীদলগুলোর সে সক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়নি।

কিন্তু এ দলগুলোর গত এগার বছরের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে গেলে আরেকটি বাস্তবতা মনে রাখা দরকার। জনপ্রিয়তার বিচারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আসার মতো জনসমর্থন এদের সবসময়ই ছিল। এমনকি পেশীশক্তির দিক থেকেও আওয়ামী লীগকে পরাজিত করার ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাদেরকে লড়তে হয়েছে এজেন্সি ও প্রকল্প-শাসিত এক ভয়ঙ্কর সরকারের বিরুদ্ধে। সরকার-পক্ষের গুম-খুন-জুলুম তারা তো ভোগ

করেছেই। তারচেয়ে বড় কথা, গণতান্ত্রিক দাবির প্রতি কোনোপ্রকার সম্মতি জানানোর মতো অবস্থায় সরকার ছিল না বলে, বিরোধী-পক্ষের 'রাজনীতি-করা'কেই তারা অসম্ভব করে দিয়েছিল।

ঠিক এ বাস্তবতাতেই 'ছাত্র'-আন্দোলন আবির্ভূত হয় ত্রাণকর্তা হিসাবে। ছাত্রছাত্রীদের নিরীহ দাবি, সে দাবির মধ্যে ছাত্রলীগের অনুপ্রবেশকারী 'গুণ্ডা'দের নির্বিচার হামলা, ছাত্রীদের আক্রান্ত হওয়ার ভিজ্যুয়াল ভাইরাল হওয়া, ছাত্রহত্যা এবং হত্যার আগ-মুহূর্তের ছবি প্রতীক হয়ে ওঠা, সন্তানের দুর্দমনীয় অংশগ্রহণের চাপে ঢাকার মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সরকারকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় রেখেই আন্দোলন ছাত্র-আন্দোলন থেকে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। তখন সরকারের, এমনকি দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'বিকল্পহীন' সরকারেরও আর কিছু করার ছিল না।

'ছাত্র' বর্গের সাথে 'জনতা'র একাত্ম হওয়ার ভিত্তি

এ আন্দোলনের সাথে 'ছাত্র' বর্গটির জৈব সম্পর্ক বোঝার জন্য আরো উদাহরণ দেয়া যাক। দ্বিতীয় সপ্তাহান্তে যখন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন বেশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে, লাশ পড়েছে এবং আবদারের বদলে আন্দোলন বিরোধে রূপ নিয়েছে, তখন দরকার হয়ে পড়েছে স্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা। 'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক' ওই জরুরি মুহূর্তে আন্দোলনের সমর্থনে ধারাবাহিক প্রোগ্রাম করা শুরু করে। উপস্থিতির দিক থেকে প্রোগ্রামগুলো খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও এগুলোর প্রতীকী মূল্য ছিল অসাধারণ। দেশের সমগ্র মানুষ এর মধ্য দিয়ে দাঁড়ানোর এবং পক্ষ-ঘোষণার উদাহরণ পেয়ে গিয়েছিল। এরকম ভীতিকর সময়ে আরেকটি গোষ্ঠী বিপজ্জনক সব স্থান ও সময়ে কর্মসূচি পালন করেছে। এ সংগঠনের নাম 'সন্তানের পাশে অভিভাবক'। যারা এ কাজগুলো করেছেন তারা যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তাদের কাজের নৈতিক ভিত্তি ছিল 'ছাত্র'-সংশ্লিষ্টতা।

'ছাত্র' বর্গটির স্পর্শকাতরতা প্রতিষ্ঠিত হবার পরে এর সাথে সম্পর্কিত হতে সমাজের অপরাপর বর্গের আর কোনো অসুবিধাই হয়নি। কারণ, দুঃশাসনের দৌলতে সমাজে সে অবস্থা আগে থেকেই বিরাজ করছিল। সরকার দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন নিয়ে মশকরা করেছে। তা গায়ের জোরে সামলে উঠতে পারলেও মানুষের মধ্যে সে ব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি হতাশা ছিল। নজিরবিহীন লুটপাট আর অর্থপাচারের সংবাদের মধ্যে মানুষ দেখছিল হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আর বাজারের উপর সরকারের কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। তার আবার প্রধান কারণ এই যে, সরকারের ঘনিষ্ঠ লোকজনই এসব ব্যবসার প্রধান কারবারি। মানুষজন চোখের সামনে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য ব্যাংক আর আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে লুট হতে দেখেছে। সরকার এসব নিয়ে কোনো অর্থপূর্ণ কৈফিয়ত দেবারই দরকার বোধ করে নাই। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ দেশের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে সরকারের আজ্ঞাবহ দাসানুদাস হিসাবে কাজ করতে দেখেছে। সরকার টানা এমনভাবে আচরণ করে গেছে যেন এ ধরনের পরিস্থিতিকেই 'স্বাভাবিক' দশা হিসাবে মানুষ ভাবতে অভ্যস্ত হয়। আসলে জনগণ এক দীর্ঘমেয়াদি হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিল, যা থেকে উত্তরণের কোনো পন্থা তার জানা ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে গরিবি কিংবা ভীতি দিয়েও পরিস্থিতিটা ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যাবে না। আওয়ামী শাসনামলের প্রলম্বিত দীর্ঘ অন্ধকারের নিচে বাংলাদেশের মানুষ নাগরিক হিসাবে এক ভয়াবহ অসম্মান এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের গল্প ছিল তার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু লোকে দেখল, হাজার হাজার সার্টিফিকেটধারীর জন্ম মুক্তিযুদ্ধের পরে, কিংবা জাল সনদ নিয়ে চাকরির সুবিধা নিয়েছে অনেকে – দেশের

সংবাদমাধ্যমগুলো অতি-নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যেও এ ধরনের সংবাদ অনবরত প্রকাশ করেছে, কিন্তু সরকার কিংবা তার অনুগত চেতনাধারীরা এমনকি কৈফিয়ত দেবারও দরকার বোধ করছে না। 'উন্নয়নের গল্প' এ দীর্ঘ শাসনামলের প্রধান প্রচার-উপাদান হলেও তথ্য-উপাত্ত প্রতিনিয়ত বলছিল, বাংলাদেশের অবকাঠামোর প্রতি ইউনিটের নির্মাণ-ব্যয় দুনিয়ার সর্বোচ্চ, আর মজুরি দুনিয়ার সর্বনিম্ন। পদ্মাসেতুর পিলার-গণনা আর মেট্রোরেলের প্রতি কিলোমিটার সমাপ্তিকে উপলক্ষ করে প্রচারণায় কানে কড়া পড়ে যাবার ফাঁকে বিপুল মানুষের দীর্ঘশ্বাস জমা হচ্ছিল ক্রমাগত। প্রতিনিয়ত সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার গল্প উৎপাদন চলছিল, কিন্তু প্রতিটি সূচকেই বাংলাদেশের অবস্থান দাঁড়াচ্ছিল সবার নিচে।

এর মধ্যেই একের পর এক দুর্নীতির চিত্র উঠে আসতে থাকে। 'হাজার কোটি টাকা' এক প্রাত্যহিক সংখ্যা হয়ে দারিদ্র্যজর্জরিত মানুষকে উপহাস করতে থাকে। পরীক্ষার প্রশ্ন-ফাঁস হয়ে ওঠে নিত্যচিত্র। বিসিএস পরীক্ষা নিয়ে মধ্যবিত্তের আকুলতার মধ্যেই উঠে আসে পিএসসির প্রশ্ন-ফাঁস কাণ্ড। বেগমপাড়া, সুইস ব্যাংক, মিলিয়নিয়ার বৃদ্ধির উচ্চহারের পাশে বাজারে আসে পনের লাখের ছাগল আর কোটি টাকার গরু। পুরনো অর্থমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, 'চার হাজার কোটি এমন বেশি কিছু না'। এবার প্রধানমন্ত্রী বললেন, তার পিয়নই চারশ কোটি টাকার মালিক। পুরো জনগোষ্ঠী এভাবে এক ধারাবাহিক মকারির মধ্যে পড়ে যায়। অবৈধভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র দখলে রাখা এক ছোট কিন্তু প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি আর মশকরার মধ্যে পুরো জনগোষ্ঠী ভয়ানক অসম্মানবোধ আর অনিশ্চয়তার শিকার হতে থাকে। তাই আন্দোলনের গতি ত্বরান্বিত হলে প্রথম সুযোগেই পুরো দেশের মানুষ তার সাথে পরম সক্রিয়তায় একাত্ম হয়।

'ছাত্র' বর্গটির উপর এ গুরুত্ব-আরোপ অবশ্য কোনোক্রমেই জনতার অংশগ্রহণ ও প্রাণদান এবং আগে থেকেই সক্রিয় বহু ব্যক্তি ও পক্ষের অবদানকে খাটো করে না। কিন্তু ঘটনাটা এবারই কেন এভাবে ঘটল, তার প্রক্রিয়াগত ব্যাখ্যার জন্য বোধহয় এ বর্গটিকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দিয়েই আলোচনা করতে হবে।

গণভবনে আন্দোলনকারীরা

আন্দোলনের পরিসর ও এজমালি ভাষা

তবে আমরা যদি এ আন্দোলনে গণপরিসর তৈরি হওয়ার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে চাই, তাহলে অন্য আরেকটি ব্যাপারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সামনে আনতে হবে। আওয়ামী লীগের গত অন্তত এগার বছরের শাসনে সবচেয়ে বড় অন্যায়টা ছিল একক অর্থের একক ভাষ্যকে অন্যায্যভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তোলা এবং সে অনুপাতে অন্য কোনো অর্থ বা স্বর বা বয়ানের উপস্থিতি অসম্ভব করে তোলা। এ ঘটনার সবচেয়ে বড় বলি মুক্তিযুদ্ধ। জনযুদ্ধ হিসাবে এবং অল্পকিছু বিরোধিতাকারী ছাড়া বাদবাকি মানুষের লড়াই হিসাবে আগের দশকগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের যে প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল, তার সবটাকে নস্যাৎ করে দিয়ে শাসকগোষ্ঠী একে নিজেদের সুবিধাজনক বয়ানের এক বলির পাঠা বানিয়ে তুলেছিল। তার সাথে খাপে-খাপ মিলে না, এমন সকল পক্ষকে পাঠিয়ে দিয়েছিল 'অপরে'র কোঠায়। এ বিপুল-অধিকাংশ মানুষের 'অপর-কোঠা'র নাম তারা দিয়েছে 'রাজাকার'। এ ভাষা কতটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল তার এক নজির এই যে, বিরোধীরা তো বটেই, এমনকি সরকারি দলের সমর্থকদের পক্ষেও এ কাঠামোর বাইরে কিছু উচ্চারণ করা সম্ভব ছিল না। তারা খুব আগ্রহী ছিল তাও নয়। তবে মুখ ফসকে বা স্বাভাবিক বুদ্ধি-বিবেচনা থেকে যারাই এর বাইরে গেছে, তারাই অপদস্ত হয়েছে।

এ পটভূমিতে বলা যায়, জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বড় মোমেন্টাম তৈরি হয়েছিল তখন, যখন অর্থের এই এককত্ব এবং বয়ানের অন্যায্য দখলদারি ভেঙে পড়তে শুরু করে। ১৪ তারিখ রাতে প্রধানত ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এবং পরে লড়াইয়ের ময়দানে এ দুই বস্তু হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে। 'রাজাকার' শব্দটির যে বিপর্যয় এ সময় ঘটেছিল, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং এ আন্দোলনে তার ভূমিকা খুবই বৈপ্লবিক। অনেকেই এ নিয়ে নাকি-কান্না কেঁদেছিল। শেখ হাসিনা আন্দোলনকারীদের রাজাকার বলেনি বলে সাফাই-সাক্ষ্য দিয়েছিল বহুজন। তারা আসলে মিথ্যাচার করেছিল। শাসকপক্ষের অন্ধ সমর্থক ছাড়া বাকিদের রাজাকার কোঠায় ফেলা আওয়ামী লীগ সরকারের অন্তত এক দশকের বিভেদমূলক শাসনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এ মাহেন্দ্রক্ষণে সে অস্ত্রের পতন ঘটে। একই সাথে পতন ঘটে 'বিকল্পহীন' শেখ হাসিনার। রাশি রাশি কার্টুন ও কার্টুনমূলক অভিধা জড়ো হয় তার নামে। আর এর মধ্য দিয়েই আসলে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বিপুল জনগোষ্ঠীর কণ্ঠরোধকারী একক অর্থ আর একক বয়ানের ভিত খসে যায়। তাতে বহু ভাষা এক লক্ষ্যে লীন হয়ে তৎপর হয়ে ওঠার পরিসর তৈরি হয়। বিএনপি বা জামায়াতের মতো অন্য দলগুলো বা বামপন্থিরা বস্তুত এ পরিসরেই ভাষা বা বয়ানের কোনো সংকট ছাড়াই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই এজমালি ভাষার ঐতিহাসিক তাৎপর্য

আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক বহুমাত্রিক অভ্যুত্থানকালে জনপরিসরে যে ধরনের এজমালি ভাষা তৈরি হওয়ার কথা উপরে বলা হল, তার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের ব্যাপারে হুঁশিয়ার না থাকলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গঠনে এর গুরুত্ব ও ভূমিকা অনুধাবন করা যাবে না। সাংস্কৃতিক রাজনীতির এক জল-অচল দ্বি-বিভাজনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশের গত অন্তত চার দশকের রাজনীতি আকার পেয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, পঁচাত্তর-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আশির দশকে প্রভাবশালী ধারাটা তৈরি হয়। 'সেকুলার', 'প্রগতিশীল', 'মৌলবাদবিরোধী' এবং 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' – এ চার বর্গের সমষ্টি হিসাবে এর কাজ-চলতি পরিচয় দাঁড় করানো যায়। [বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য: মোহাম্মদ আজম, 'সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ', সংহতি, ২০২২]। এ ধারাকে আওয়ামী-রাজনীতির সাথে একাট্টা করে দেখলে ভুল হবে। তবে কাল-পরম্পরায় এরা একাকার হয়ে যায়। বলা দরকার, এরা আসলে পরস্পরের উপর ভর করে। মোটের উপর এ ধারাটিই ১৯৯২ সালে ঘাতক-দালাল-নির্মূল-কমিটির ব্যানারে একত্র হয়েছিল। ২০১৩ সালের শাহবাগ আন্দোলন তারই ধারাবাহিকতা; তবে ততদিনে আওয়ামী-শাসনের সাথে এর যোগ অনেক প্রত্যক্ষ এবং ক্ষেত্রবিশেষে অঙ্গাঙ্গি হয়ে উঠেছিল। মোটেই বিস্ময়কর নয়, ২০১৩-র শাহবাগ-শাপলা বাইনারিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পূর্বোক্ত দ্বি-বিভাজন বিকট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

মুশকিল হল, আওয়ামী শাসন ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো 'সেকুলার', 'প্রগতিশীল', 'মৌলবাদবিরোধী' এবং 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী' ইত্যাদি পরিচয়কে একদিকে নজিরবিহীন সংকীর্ণতায় সীমিত করে এনে দেশের বিপুল অধিকাংশ মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল 'অপরে'র কোঠায়। অন্যদিকে ভদ্রলোকশ্রেণির অনেকের পছন্দের এ বর্গগুলো ভাড়া-খাটা সেবায়েত হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে শাসকদলের অন্যায্যতার পক্ষে। ঠিক এখানেই তৈরি হয়ে উঠেছে ওই এজমালি ভাষার পরিসর।

এ পরিসর এবং ভাষা আপসে-আপ তৈরি হয়নি, বা উড়ে এসে রাস্তা দখল করেনি। আগের দশকগুলোতে বহুজন এ বিষয়ে বিরামহীন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা চালিয়েছে। আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিপুল ছাত্রছাত্রী-যে নানা ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, পাঠচক্র, পত্রিকা প্রকাশ ও সমধর্মী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রবলভাবে যুক্ত ছিল, তা মোটেই কাকতালীয় নয়। তবে স্বৈরশাসনের প্রবলতার মধ্যে এ ভাষা পাখা মেলতে পারেনি। তার বাস্তব কার্যকরতা পরীক্ষার সুযোগ মেলেনি। রাজপথে প্রত্যক্ষ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে, এক দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে

সমন্বিত লড়াই চালাতে গিয়ে ওই ভাষার সক্রিয়তা ও প্রকাশক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়। তার চাপা-পড়া অন্তর্নিহিত শক্তি তাজা হয়ে রক্ত-ভেজা মাটিতে নতুন শক্তি হয়ে অঙ্কুরিত হয়। তৈরি হয় নতুন পরিস্থিতি। নতুন এ ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এক গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এবং বহুত্ববাদী গণপরিসরের স্বপ্ন। সমাজে বিদ্যমান নানা বৈপরীত্য মেনে আলাদাভাবে যারা অস্তিত্ববান ছিল, লড়াইয়ের ময়দানে জন্ম নেয়া এ ভাষা তাদের জন্য একক পাটাতনের বন্দোবস্ত করে। প্রত্যেকে নিজের আদি অবস্থানকে পুনর্গঠন করে, অনেক কিছু কাটছাঁট এবং বহুকিছু যুক্ত করে শামিল হয় এ ভাষায়। অন্তত চার দশকের অগণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রভাবশালী ভাষা এভাবে মুলতবি হয়ে যায়। বিপরীতে জন্ম নেয় এক নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাবনা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের এ গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করা ছাড়া এর ফসল ঘরে তোলা অসম্ভব।

এ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর অবস্থা

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে বিএনপি ও এর ছাত্রসংগঠন, জামায়াত ও এর ছাত্রসংগঠন, অন্য ইসলামপন্থি দল এবং বামপন্থি দলগুলোর কিছু অংশ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তার মানেই হল, এরা সবাই পূর্বোক্ত এজমালি ভাষার ভাগিদার। ফলস্বরূপ, অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এরা অভ্যুত্থানের অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রশ্ন হল, নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচির বাইরে এসে এই সামষ্টিক ভাষায় তারা কি অন্তত কিছু সময়ের জন্য চলতে পারবে? সে অবস্থানটা পরিষ্কার হওয়ার মতো এখনো যথেষ্ট সময় পার হয়নি। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ অভ্যুত্থানের যদি কোনো ফল অর্জন করতে হয়, তাহলে সে কাজটিই করতে হবে। একদিক থেকে এজমালি ভাষায় যদ্দুর সম্ভব থিতু থাকা অভ্যুত্থানজনিত নৈতিকতার অংশ। কারণ, ওই ভাষার অধীনেই সবাই অভ্যুত্থানে মরণপণ লড়াই করেছে। একটা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সূচনা করতে হলে এ নৈতিকতা চূড়ান্ত যত্নের সাথে রক্ষা করতে হবে। ভিন্নমতগুলোকে ধারণ করা, এবং নিজেদের ভিন্ন অবস্থানগুলোকে সংকুচিত করে সম্ভব সর্বোচ্চ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ করার দায়িত্বশীলতা রক্ষা করলেই কেবল অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক সুফল হিসাবে লিবারেল ডেমোক্রেটিক বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যেহেতু আওয়ামী লীগ বাদে বাকি সবাই কোনো-নো-কোনোভাবে সম্মত ছিল, আর সবাই আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধেই কাজ করেছে, এ দলটি এ মুহূর্তে অনেকটা দলছুট অবস্থায় আছে। দলটি এখন জনমতের দিক থেকে অন্তত প্রত্যক্ষভাবে বা পার্টিগতভাবে অংশ নেয়ার অবস্থায় নেই। সরকার ও পার্টির মধ্যে কোনো পার্থক্য না রাখার যে গলদ, তার করুণ পরিণতির শিকার হল দলটি। অবশ্য এ সংস্কৃতি অন্য দলগুলার ক্ষেত্রেও প্রায় একই রকম।

এ প্রসঙ্গে অজনপ্রিয় মত-প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে একটা জরুরি কথা উত্থাপন করে রাখা দরকার। অনেকের মধ্যে এ ধরনের আলাপ ও মনোভাব লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আওয়ামী লীগের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা বা ফ্যাসিস্ট সংগঠন হিসাবে আওয়ামী লীগকে সব হিসাবের বাইরে রাখা কর্তব্য। এ মত অতি বিপজ্জনক। এখনো জনরোষ বা বিপর্যয়ের স্মৃতি খুব তাজা বলে এর বিরুদ্ধে হয়ত রয়েসয়ে কথা বলতে হবে। কিন্তু এ অসম্ভব ও বিপজ্জনক মতটি প্রশ্রয় না পাওয়াই সবার জন্য মঙ্গলজনক।

প্রথম কথা হল, যেকোনো পরিস্থিতিতেই নৈতিক বিচার ও আইনি বিচারের মধ্যে ফারাক বজায় রাখার দিকটাকে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা রাষ্ট্রে বসবাস করছি, বিশুদ্ধ

সামাজিক ব্যবস্থাপনায় নয় – এ হুঁশ যত তাড়াতাড়ি হবে, ততই ভালো। দ্বিতীয়ত, এখনকার অজনপ্রিয় অবস্থায়ও দেশের কোটি কোটি মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। ফ্যাসিস্ট শাসনের দগদগে স্মৃতি বা বাস্তবতা তাদের বিশেষ বিচলিত করতে পারেনি দেখে আমরা নৈতিক অভিযোগ তুলতে পারি, কিন্তু একে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। এসব মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো রাষ্ট্রীয় সংস্কার বা রাজনৈতিক সমাজ গড়ে তোলার চিন্তা অবাস্তব। তৃতীয়ত, যেসব ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাসের জোরে আওয়ামী লীগ এ ধরনের এক শাসন কায়েম করতে পেরেছিল, সেগুলো পুরনো এবং বস্তাপচা হলেও সমাজে অতি প্রবল। বিশেষত, আধা-শিক্ষিত নাগরিক সমাজের মধ্যে। এমতাবস্থায় এগুলোকে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে অবদমিত করতে চাইলে তা বর্তমান রূপ বজায় রেখেই আরো চাঙা হবে। উন্মুক্ত মাঠে ক্রিয়া করলেই আলো-হাওয়া আর প্রবল যুক্ততর্কের মধ্যে সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার হতে পারবে। মনে রাখা দরকার, পনের বছর ভয়াবহ নিপীড়ন আর দমনে রেখেও পুরনো সরকার বিএনপি বা জামায়াতের ধক মোটেই নষ্ট করতে পারেনি। তুলনামূলক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী ভাবাদর্শিক ভিত্তি নির্মূল করার প্রশ্নই আসে না। সেটা পদ্ধতি নয়, গণতন্ত্র তো নয়ই, এবং তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে বলে ইতিহাসে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এমতাবস্থায় দ্রুত এ মর্মে জোর দাবি তোলা উচিত যে, বিগত দীর্ঘমেয়াদি সরকারের এবং দলের যেসব ব্যক্তি বা কাঠামো কোনো-না-কোনোভাবে আইনি অপরাধে যুক্ত, তাদের বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষকে সম্পৃক্ত করা এবং অভিযুক্তের পূর্ণ আইনি অধিকার রক্ষা করা নতুন বাংলাদেশ গড়ার দৃশ্যমান প্রথম পদক্ষেপ হয়ে উঠতে পারে। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে দলটি সম-অধিকারের ভিত্তিতে রাজনীতি করার অধিকার পাওয়া উচিত।

তবে, উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়, বর্তমান সরকারের সংস্কার-প্রক্রিয়ায় গত সরকারের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের এবং এমনকি তাদের পাকা সমর্থক হিসাবে দলীয় ব্যক্তিদেরও অংশগ্রহণ করার কোনো বাস্তবতা নেই। এটা শুধু নৈতিক ব্যাপার নয়, এর রাজনৈতিক ভিত্তিও আসলে অনুপস্থিত।

শিল্পী : সুলতান ইশতিয়াক

অন্তর্বর্তী সরকারের এখতিয়ার ও কর্মপ্রণালি

অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার গঠিত হয়েছে এক নজিরবিহীন মতৈক্যের ভিত্তিতে। কোনো রাজনৈতিক সরকারের এ ধরনের জনসমর্থন খুব বিরল। মনে রাখতে হবে, বুদ্ধিজীবী সমাজে সরকারের সদস্যদের কাউকে কাউকে নিয়ে সমালোচনা থাকলেও আন্দোলনকারী পক্ষগুলো মোটাদাগে সমর্থন জানিয়েছে, এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সময় দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে।

এ সরকারকে কী ধরনের সংস্কার করতে হবে, তা এখন নতুন করে ঠিক করার বিশেষ জরুরত নাই। বাংলাদেশ যে খানিকটা অচল ধরনের রাষ্ট্রকাঠামোয় চলছে, সে বিষয়ে বেশিরভাগ পক্ষ একমত, আর সে ধারণার অনুকূলে বিভিন্ন পক্ষ বিগত দশকগুলোতে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। বিশেষত, গত আওয়ামী সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর হারে এবং খারাপভাবে নষ্ট হওয়ার প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের দাবিও খুব প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

সুতরাং এখতিয়ারের প্রশ্নে এ সরকারের সামনে আসলে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই। আর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করাও খুব সহজ। ধান্দাবাজ ও পার্টিজান নয়, এমন অনেক পক্ষ সবক্ষেত্রেই কিছু দাবি ও প্রস্তাব আগে থেকেই দিয়ে আসছে। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও অনেকে খুব যত্নের সাথে এ কাজ করছে। এখন দরকার প্রত্যেক আলাদা বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটা কমিটি গঠন করা। কমিটিতে সরকারের লোকজন, পরীক্ষিত ও যোগ্য এক্সপার্ট, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সাথে যুক্তদের মধ্য থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা মানুষজন থাকবে। কমিটি খুব দ্রুততার সাথে অথচ যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে প্রস্তাব পেশ করবে। সত্যি বলতে কী, বেশিরভাগ প্রস্তাবের জন্য বাড়তি কোনো টাকারই প্রয়োজন হবে না। যদি খুব জরুরি কোনো সংস্কারের জন্য টাকা দরকারও হয় তা বরাদ্দ করতে হবে।

আর সব ক্ষেত্রেই মনে রাখতে হবে, জনপরিসরে সক্রিয় গোষ্ঠী হিসাবে বাম সংগঠন, বিএনপি বা জামায়াতের মতো পক্ষগুলোর সম্মতিও খুব জরুরি। আন্দোলনকারী এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে। তাদের সম্মতি ব্যতিরেকে এ ধরনের কাজ খুব গতিও পাবে না, আর প্রয়োজনীয় সময়ও পাওয়া যাবে না।

অভ্যুত্থান, রাষ্ট্র-সংস্কার প্রস্তাব ও জেন-জি

রাজনৈতিক ও দার্শনিক কিছু কিছু বিমূর্ত দিক উহ্য রাখলে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র-সংস্কার বলতে আদতে বোঝাবে অ-রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে প্রবেশ করা। বহু-সংখ্যক কাঠামো মিলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো কাজ করে – রাষ্ট্র-সম্পর্কিত এ গোড়ার কথা মনে রাখলে দেখব, আমাদের কাঠামোগুলো কার্যত ধ্বংস হয়েছে। আগেও জুতের ছিল না, আর গত অন্তত এগার বছরের দলীয় শাসনে একেবারে গেছে। কাজেই কাঠামোগত নৈর্ব্যক্তিকতা খানিকটা প্রতিষ্ঠা করা গেলেও ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা। দুর্নীতি ও লুটপাটে একটা ন্যূনতম কাঠামোগত বাধা তৈরি করতে পারলেই আমরা ধরে নেব বিরাট উন্নতি হয়েছে।

আমার প্রস্তাব হল, প্রতিটি ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব কার্যকর কাঠামো প্রণয়ন করা। কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্য হবে দুটি। এক. ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না; বরং ব্যক্তি কাজ করবে কাঠামোর অধীনে; দুই. ক্ষমতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার 'চেক এন্ড ব্যালেন্স' কাঠামোর মধ্যেই নিহিত রাখা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে।

এ ধরনের কাঠামোর প্রস্তাব ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আশাবাদী হওয়ার মতো যথেষ্ট অনুকূল একটা বিশ্ব-বাস্তবতায় আমরা এখন অবস্থান করছি। তার মূল কারণ, আইটি সেক্টরের অভাবনীয় উন্নতির কারণে এখন আমাদের হাতে যে সুযোগ আছে, আগে কখনোই গরিব একটা দেশের হাতের নাগালে সে সুযোগ ছিল না। আমি এ প্রস্তাবের পক্ষে এক প্রস্ত তত্ত্বায়ন করব, আর সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেব।

তত্ত্বায়নের ব্যাপারটা ছাত্র-জনতার এ মুভমেন্টের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। এ আন্দোলনে জেন-জির প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে সামনে এসেছে এবং আলোচিত হয়েছে। অনেকেই এর ভালো-মন্দ বিচার করেছেন। বলেছেন, এ প্রজন্মকে যারা 'মন্দ' বলে জানতেন, তাদের সে ধারণা বদলে গেছে। আমাদের প্রস্তাব, ভালো-মন্দের এ নিরিখ আসলে একটা মন্দ নিরিখ। একে বৈশিষ্ট্য হিসাবে সাব্যস্ত করা কেবল বেহতর নয়, বস্তুত অপরিহার্য। কেননা এটা এমন এক বস্তুগত পরিবর্তন, যা মানুষের যাবতীয় সম্পর্ককে বদলে দিয়ে নতুন ভিত্তি-কাঠামো আর উপরি-কাঠামো তৈরি করেছে। স্বভাবতই বদলে গেছে অনুধাবন প্রক্রিয়া। আগের প্রজন্মগুলো নতুন ব্যবস্থার সাথে পুরনো ব্যবস্থার এক দো-আঁশলা সম্পর্কের মধ্যে জীবনযাপন করছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম অন্তত মানবিক সম্পর্ক আর মনোজাগতিক অবস্থার দিক থেকে পুরোপুরি এ অবস্থার মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। এ ব্যবস্থা যে কত আলাদা এবং আগের প্রজন্মের কতটা অচেনা, তা বাস্তবে এ অভ্যুত্থানে দারুণভাবে বোঝা গেছে। সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই নানা বিচার-বিশ্লেষণ আগামী দিনগুলোতে হবে। কিন্তু যে বস্তু এখনো আলোচনায় আসেনি তা হল, তথ্যপ্রযুক্তির যে প্রাপ্তি দুনিয়ার জন্য এ অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করেছে, এবং যার এক অসাধারণ নজির আমাদের জেন-জি প্রজন্ম কাজে খাটিয়ে দেখিয়েছে, তাকে রাষ্ট্রকাঠামোতে পুরোপুরি আত্মসাৎ করে খোদ রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনার ধারণাটিকেই বদলে দেয়া।

একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা ব্যাখ্যা করা যাক।

ধরুন, রাষ্ট্র সিদ্ধান্ত নিল, মূলধারার মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। দেশের মানুষের ইংরেজিভীতি আর ইংরেজিলিপ্সার নিরিখে এটা এখন এক জরুরি উদ্যোগ। আগে যেখানে এ ধরনের কোনো উদ্যোগের জন্য অন্তত দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করে তারপর এগুতে হতো, এখন সেখানে কিছু জুতসই মডিউল কেন্দ্রীয়ভাবে ভিডিও ফরম্যাটে তৈরি করে বিদ্যমান জনশক্তি দিয়েই প্রান্ত পর্যন্ত সেটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের জন্য আয়োজন করা যেতে পারে অনলাইন ট্রেনিং। প্রান্তীয় কোনো স্কুলে এটা বাস্তবায়নের জন্য আপনার দরকার হবে একটা কম্পিউটার আর একটা মোটামুটি সজ্জিত ক্লাসরুম। কোনো নির্দিষ্ট স্কুলে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের উপস্থিতি তদারক করা যেতে পারে ঢাকায় বসে বা কোনো বিভাগীয় শহর থেকে। যে কোনো মুহূর্তে যেকোনো ধরনের তদারকি চলতে পারে কেন্দ্র থেকে শুরু করে যেকোনো মধ্যবর্তী অফিসে বসে। পাঠদান, উপস্থিতি, পরীক্ষা, নম্বর, প্রান্তীয় পরিদর্শকদের তৎপরতা – সবকিছু রূপান্তরিত হতে পারে ডাটায়, যেখানে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে দেশের প্রধান অফিস পর্যন্ত সবার প্রবেশের অধিকার থাকবে। এই যোগাযোগ, সংযুক্তি এবং তথ্যের অবারিত আবহে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা আর দায়িত্বহীনতা বিশেষভাবে দূরীভূত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে; আর পুরো ব্যাপারটা ঘটবে আগের যেকোনো পদ্ধতির তুলনায় অনেক কম খরচে এবং অনেক 'চেক এন্ড ব্যালেন্সে'র মধ্য দিয়ে।

ব্যাপারটাকে তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থা হিসাবে দেখলে এর বিপ্লবী তাৎপর্য বোঝা যাবে না। উন্নত বিশ্ব উন্নত হয়েছে এ ধরনের কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতার ভিতর দিয়ে। প্রথম সুযোগেই তারা তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাও গ্রহণ করেছে। আমরা প্রথমে কলোনিয়াল অভিজ্ঞতার কারণে এবং পরে প্রধানত

গরিবির কারণে এ ধরনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারিনি। গত এক দশকে তথ্যপ্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণেই আমাদের হাতে প্রথমবারের মতো অল্প টাকায় এমন ব্যবস্থাপনার সুযোগ এসেছে। আর চলতি অভ্যুত্থানে ক্রিয়াশীল জেন-জি বাস্তবতা সেকথা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

বিগত আওয়ামী সরকারের একটা বড় অসততা এই যে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপক প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও তারা আসলে এ ধরনের উদ্যোগের দিকে সামান্যই গেছে। ইন্টারনেট সেবার মানের দিক থেকে দুনিয়ায় ঢাকা শহরের অবস্থান কত, তা একবার পরীক্ষা করলেই কথাটার মর্মার্থ উপলব্ধি করা যাবে। বস্তুত, জৈবপ্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তির অসামান্য বিকাশ দুনিয়ার উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে প্রাচুর্য এনেছে, তা থেকেই বিগত সরকার তার লুটপাট ও অর্থপাচারের টাকা জুগিয়েছে। আমরা নতুন প্রজন্মের নানা গল্প শুনেছি। অনলাইন বিজনেস এবং আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে উপার্জনের গল্প যথেষ্ট চাউর হয়েছে। কিন্তু এর যে সম্ভাবনা, তা বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ সরকার নেয়নি।

এদিক থেকে বিচার করলে এই জেন-জি অভ্যুত্থানের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য রাষ্ট্রীয় সংস্কারে কেবল তখনি অনূদিত হতে পারবে, যখন আইটি বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ আমলে এনে নতুন কাঠামোগুলো সাজানো হবে। ধরা যাক, কোনো একটি কাঠামো এভাবে সম্পূর্ণ কার্যকর করতে দশ বছর সময় লাগবে। তাহলেও এটাই করতে হবে। পুরনো ধারার এনালগ ব্যবস্থাপনা কাজ করবে না। অন্য অনেক কারণের মধ্যে কাজ না-করার এক প্রধান কারণ এই যে, আমাদের টাকা খুবই কম, আর কম টাকায় কেবল এভাবেই কার্যকর ব্যবস্থাপনার আয়োজন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে করা সম্ভব।

উপরে রাষ্ট্র-সংস্কার প্রসঙ্গে যেসব বৈশিষ্ট্যগত প্রস্তাব দেয়া হল, তার সাথে ভিত্তি-চাওয়া হিসাবে আর মাত্র একটা যোগ করা যেতে পারে। তা হল শিক্ষায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ। দুনিয়ায় শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ন্যূনতম আদর্শ মাপ ধরা হয় জিডিপির শতকরা ছয় শতাংশ। উপমহাদেশের কোনো কোনো দেশে আছে শতকরা চার শতাংশ। আর আমাদের আগে ছিল দুইয়ের মতো, গত সরকারের আমলে নেমে এসেছে পৌনে দুইয়েরও নিচে। শুনেছি, এর মধ্যেও একাংশ নানান নামে শিক্ষাখাত থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। বিস্তারিত বলার দরকার নেই। শুধু এ কথা বলাই যথেষ্ট হবে যে, রাষ্ট্র-সংস্কারের এক নম্বর চাওয়া হওয়া উচিত পাঁচ বছরের একটা কর্মপরিকল্পনা, যেখানে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ জিডিপির শতকরা চার ভাগে উন্নীত করা যায়। ছয় না বলে চার বলার কারণ, আমাদের মতো গরিব দেশগুলো ইতিমধ্যেই তা করছে।

People wave a Bangladesh flag as they climb a structure at Ganabhaban, the Prime Minister's residence, after the resignation of the Sheikh Hasina in Dhaka, Bangladesh, August 5, 2024. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

শেষ কথা: ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণ

জনগোষ্ঠীর কল্যাণের বাইরে রাষ্ট্র নিয়ে কোনো জাতীয়তাবাদী ফ্যাটিশ অপ্রয়োজনীয় বালখিল্য হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। আগেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তির উন্নতির ফলে দুনিয়া এখন উৎপাদনের দিক থেকে এমন অবস্থায় আছে, যেখানে সমস্ত মানুষের জন্য মৌলিক চাহিদাগুলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব। এ অবস্থা দুনিয়াতে আগে কখনোই ছিল না। আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থার দুর্বলতাহেতু আঠার কোটি মানুষের জন্য দুনিয়ার এ উন্নতিকে কাজে খাটাতে পারিনি।

এমতাবস্থায় আমাদের দরকার এমন এক রাষ্ট্র যা ব্যবস্থাপনার উন্নতির মধ্য দিয়ে সম্পদ আহরণ ও যথাসম্ভব বণ্টনের ব্যবস্থা করবে। দুনিয়ার নানা প্রান্তে যেসব সুযোগ অবারিত আছে, সেগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে নাগরিকদের জন্য সুবিধাজনক পরিস্থিতি তৈরি করবে। এরকম এক উদ্যোগের সুযোগ-যে জুলাই অভ্যুত্থান ২০২৪ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। আমরা সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারব কি না, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই তা স্পষ্ট হবে।

বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামো আদতে বড়জোর সাত-আট কোটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে – তাও অনেক ক্ষেত্রে নিপীড়নমূলক কায়দায়। বাকি দশ-এগার কোটি এর আওতার বাইরেই থেকে গেছে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের